সুরভিত তাঁবেয়ি জীবন

সুরভিত তাবেয়ি জীবন

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
লেখকের কলম থেকে ৯
সততার মানসপুত্র ১০
আত্মসংযম ২০
নিমগ্ন ইবাদাতে ৩০
শুধুই দ্বীনের জন্য ৩৬
দুনিয়াবিমুখতা ৪৪
বিষাদের সুর ৫৬
মৃত্যুর বিভীষিকা ৬৬
সেই ভয়ানক দিন ৭৫
গুরুত্বের পরম্পরায় ৮৪
শেষ কথা ৯২

সততার মানসপুত্র

তাবেয়িদের জীবনী পড়তে গিয়ে, তাঁদের যে গুণগুলো আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছে সেগুলো হলো—তাঁদের সততা ও সারল্য। তাঁদের দিন-রাতের প্রতিটি কাজকর্ম আমি গভীরভাবে দেখেছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি আর অবাক হয়েছি, মানুষ এতটা সত্যনিষ্ঠ হয় কীভাবে! তাঁদের মাঝে বহু গুণ আমি খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু তাঁদের প্রবল সততা আমার তনু-মন জুড়ে এক অপার্থিব মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের শিরে সততা ছিল রাজমুকুটের মতো। তাঁদের কথা থেকে ছড়াত সততার সুবাস, তাঁদের আচরণ থেকে বিচ্ছুরিত হতো সততার আলো, তাঁদের বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট আর হাট-বাজার জুড়ে কারা যেন সততার মণিমুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আচরণ ও উচ্চারণে তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, বোধ ও বিশ্বাসেও ছিলেন সত্যানুরাগী। আর তাঁদের হৃদয়ের শুভ্রতা তো প্রবাদতুল্য।

সততার রাজ্যের প্রবাদপুরুষ

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ি। একবার অন্য সব তাবেয়ি মিলে তাঁর ঘরে জড়ো হলেন। কথা প্রসঙ্গে সবাই একমত হলেন যে, আজ থেকে সততার রাজ্যে ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ হলেন তাঁদের নেতা। সেই সোনালি যুগের মানুষগুলো তখন ফুযাইল ইবনু ইয়াযের হাতে বাইয়াত হলেন, তাঁর থেকে নিলেন সততার দীক্ষা। আপনি ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর মাঝে সততার যেই গভীর ও বিস্তীর্ণ উপলব্ধি দেখতে

পাবেন, তা অন্য কারও মাঝে পাবেন না। অথচ তাবেয়িগণ প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্ঠা ও সততার মূর্তপ্রতীক।

কিন্তু ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ সবার থেকে একটু ভিন্ন। তাঁর কথায় ঈমান ও সততায় সিক্ত অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেত।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি ও ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর নিষ্ঠা ও সততার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কাছে সততায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ তাঁর কথায় প্রজ্ঞা ঢেলে দিয়েছেন।'[১] আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সত্যাশ্রিত। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলোও ছিল সততায় মোড়া।

একটি ঘটনা থেকে আমরা ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর সততার নমুনা দেখি। আবু রওহ হাতেম ইবনু ইউসুফ বলেন, একদিন আমি ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর দরজায় এসে সালাম দিলাম। বললাম, 'আবু আলি, আমি পাঁচটি হাদিস শিখেছি। আপনি অনুমতি দিলে আপনাকে পড়ে শোনাব।' তিনি বললেন, 'পড়ো।' আমি পড়তে গিয়ে দেখি- হাদিস ছয়টি। তিনি বললেন, 'বাবা, আগে সততা শেখো, তারপর ইলম শিখবে।'[২]

সুবহানাল্লাহ! আমরা সংখ্যা বলার সময় কিছু কম-বেশি হওয়াটা কত স্বাভাবিকভাবে দেখি। কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলাটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ এই সামান্য ব্যাপারেও কী পরিমাণ সতর্ক ছিলেন। আর কেনই-বা হবেন না! তিনি যে সততার দুনিয়ায় কিংবদন্তি ছিলেন। তিনি কীভাবে বিন্দু পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণে তাঁর সততার মিহরাব অপবিত্র করতে পারেন। অন্য মানুষের কাছে পাঁচ-ছয়ের মধ্যে বিরাট কোনো ব্যবধান না-ই থাকতে পারে, তারা নির্দ্বিধায়

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ৮/৪২৫
[২] তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির ৪৮/৪৩০

আত্মসংযম

তাবেয়িগণ সবসময় নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট মনে করতেন। নিজের ভালো কখনই তাঁদের চোখে পড়ত না। নিজের প্রতি তাঁরা প্রচণ্ড হীন ধারণা পোষণ করতেন। নিজের কাজকে সবসময় তুচ্ছজ্ঞান করতেন।

নিজেকে তাঁরা এমনভাবে মিটিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেউ তাঁদেরকে নিয়ে আলোচনা করুক, প্রশংসা করুক কিংবা তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুক; এতটুকুও তাঁরা কামনা করতেন না। নিজেকে মেলে ধরার অভিলাষ তাঁদের মধ্যে ছিল না। মনের যত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আছে, তার সবটুকু তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন। উচ্চাভিলাষ, আত্মতুষ্টি ও দাম্ভিকতাকে অন্তর থেকে ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলেছিলেন। ফলে তাঁদের জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও বিনয়ের ছাপ ছিল স্পষ্ট। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে যেমন তনু-মন জুড়িয়ে আসে, তেমনি অপার্থিব সুখ এবং অনাবিল শান্তিতে তাদের জীবন ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

তাঁরা আল্লাহর কাছে খুব করে চাইতেন, মানুষের কাছে তাঁরা যেন অখ্যাত থাকেন এবং তাঁদের পরিচয় যেন সবার কাছে অজ্ঞাত থাকে। প্রসিদ্ধি–নামযশ থেকে তাঁরা সবসময় পালিয়ে বেড়াতেন। জনসম্মুখে কেউ তাঁদের প্রশংসা করলেন খুব রেগে যেতেন।

সাধারণত তাঁরা লোকসমাগম এড়িয়ে চলতেন। তাঁদেরকে নিয়ে মানুষের মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা, জল্পনাকল্পনা কিংবা হাঁকডাক শুরু হলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতেন, চলে যেতেন লোকচক্ষুর আড়ালে। এই নিভৃতচারী মানুষগুলো সারাটা জীবন খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন।

নাগরিক কোলাহল ছেড়ে বেছে নিয়েছেন নির্জনবাস, সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন। জগতের সমস্ত হই-হাঙ্গামার মাঝেও তাঁদের জীবনে ছিল শান্ত নদীর মতো ধীরতা, চারিদিকে আত্মগরিমার তীব্র উত্তাপের মাঝেও তাদের হৃদয়ে ছিল গাছের কোমল ছায়ার শীতলতা, অশান্ত পরিবেশের মাঝেও তাঁদের অন্তরে ছিল জ্যোৎস্না রাতের স্নিগ্ধতা।

শয়তানের ফাঁদ

কুফার বিখ্যাত তাবেয়ি রাবী' ইবনু খুছাইম রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার দিন কেমন কাটছে? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমরা হলাম দুর্বল ও পাপী বান্দা। আমাদের জন্য বরাদ্দ রিযিক খাচ্ছি, আর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।'[১] তিনি যে নিজেকে 'দুর্বল ও পাপী' বলে পরিচয় দিলেন, এটা কোনো ভাষাগত সৌন্দর্য না, আবেগের আতিশয্যে বলে ফেলা কোনো কথাও না, কৃত্রিম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ তো নয়ই। বরং এটা তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাঁদের বিশ্বাসের সাধারণ চিত্র। আর রাবী' ইবনু খুছাইম, তিনি তো তাবেয়িগণের মাঝে নতুন কেউ নন। তাঁর কথাও গুরুত্বহীন বা ফেলে দেবার মতো না।

তাবেয়িগণ নিজ আমল দেখে ধোঁকার শিকার হওয়া কিংবা দুনিয়াতে নিজের জন্য প্রশংসনীয় অবস্থান কামনা করা থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকতেন।

সালাতে গভীর মনোযোগের কারণে একজন লোক মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহর প্রশংসা করল। লোকটির কথা শেষ না হতেই মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তুমি কীভাবে জানলে, সালাতে আমার অন্তর কোথায় থাকে?'[২] অর্থাৎ, তুমি একজন ব্যক্তির কোনো ব্যাপারে কীভাবে প্রশংসা করতে পারো, যেখানে তোমার কাছে সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই! দেখো, আত্মপ্রদর্শন বা লোক-দেখানোর প্রবণতা খুব

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ৪/২৫৯
[২] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল : ২০৮

নিমগ্ন ইবাদাতে

তাবেয়িগণের ইবাদাত, রোনাজারি আর আল্লাহর সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখলে আপনি হকচকিয়ে যাবেন। একবারের জন্য তাঁদের ইবাদাতগৃহের দিকে উঁকি দিয়েই দেখুন না, তাহলেই সালাত, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদাতে তাঁদের নিমগ্নতা দেখে আপনি হতবিহ্বল হয়ে পড়বেন। আপনার মনে হবে, দুনিয়া ও তার আশপাশের কোনো খবরই তাঁদের নেই। রবের সামনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই তাঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

রবের যিকিরের মাধ্যমে শুরু হওয়া সে সকালগুলো কতই না নির্মল! কতই না মনোরম রবের ইবাদাতে কাটানো সে রাতগুলো! ভোরের স্নিগ্ধ কোমল বাতাসে ভেসে আসত তিলাওয়াতের আওয়াজ। আবার রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা যেত চাপা কান্নার কাতর সুর। রবের ভালোবাসায় দিন-রাত উৎসর্গ করে দেওয়া সেই মানুষগুলোর হৃদয়ের উত্তাপ কি আপনাকে স্পর্শ করছে না? তাঁরা জানতেন, মুমিনের পরিচয় তো জায়নামাজে, তার সঙ্গী হবে কুরআন, আর রোজা তার অভ্যাস, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করাই হলো তার কাজ। তাই তো এভাবেই কাটত তাঁদের দিন-রাত। আপনি যদি কল্পনায় সেটা অনুভব করতে চেষ্টা করেন তাহলে সেই ইবাদাতের শীতলতা আপনাকেও ছুঁয়ে যাবে।

সাহস

তাবেয়িগণ মানুষকে ইবাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এটি ছিল তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইবাদাতকারীর সম্মান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে

ধরতেন। মুয়াররিক্ব আল-ইজলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে তখন যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে সঁপে দেবে, সে ওই সাহসী বীরের ন্যায়; যে যুদ্ধের ময়দানে সবাই পালিয়ে যাবার পর একাই আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।'[১]

সুতরাং, ইবাদাতে অবহেলাকারীরা হলো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী ভীরু ও কাপুরুষ। আর আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো সেই সাহসী বীরের ন্যায়, যে যুদ্ধের ময়দানে একাই দৃঢ়পদে আক্রমণ করে চলেছে।

ক্ষতি

তাবেয়িগণের আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল—ইখলাস বা আমলের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা। ইখলাসের মাধ্যমে অল্প আমলও অনেক হয়ে যায় এবং সামান্য কাজেও অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এ কথাটাই মাইমুন ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের আমল তো খুব সামান্য, তাই অল্প আমল করলেও ইখলাসের সাথে করো।'[২] তিনি মনে করতেন, আমরা যত আমলই করি না কেন, তারপরও আখিরাতে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগন্য।

একে তো আমাদের আমল কম, তারওপর সেই আমল যদি হয় ইখলাসশূন্য, তাহলে এর চেয়ে বড় লোকসান আর কিছু হতে পারে না। তাই অল্প আমলকে কাজে লাগাতে ইখলাসের কোনো বিকল্প নেই।

পরিণতি

কোনো বান্দা দুনিয়াতে যেমন ইবাদাত ও আমাল করবে আখিরাতে আল্লাহর নিকট সে তেমন প্রতিদান পাবে, এই বিষয়টি তাবেয়িগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন।

---

[১] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল : ২৪৭

[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৪/৯২

দুনিয়াবিমুখতা

তাবেয়িগণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিকায় দুনিয়ার কোনো স্থান ছিল না। দুনিয়াবি ব্যাপারে তাঁরা যারপরনাই উদাসীন ছিলেন। পার্থিব বিষয়ে না তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল, আর না ছিল এসবের ব্যাপারে তাঁদের কোনো ভ্রুক্ষেপ। দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁকজমক তাঁরা এমনভাবে উপেক্ষা করতেন, যেন এসবের সাথে তাঁদের শত বছরের শত্রুতা।

আবু সুলাইমান আদ-দারানি রাহিমাহুল্লাহকে দেখুন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছেন, 'দুনিয়ার বুকে কামনা করার মতো কোনো বস্তু আমি দেখি না।'[১] কামনা, বাসনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এই জাতীয় শব্দগুলো আপনি তাঁদের অভিধানে পাবেন না।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি নিয়ে তাবেয়িগণের এমন আরও মন্তব্য পাওয়া যায়। অন্তরকে ভাবিয়ে তোলা সেসব বাণী শুনলে মনে হবে, দুনিয়াটা বুঝি তাঁদের সামনে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার মতো চলে এসেছিল, সেখান থেকে ঘৃণাভরে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তাঁদের দেখলে মনে হবে, দুনিয়াতে তাঁরা ছেড়ে যাবার জন্য ঘর বেঁধেছেন এবং বিচ্ছেদের আশায় বাস করছেন। এ জন্য এখান থেকে তারা শুধু উপকারটুকু গ্রহণ করেছেন আর বাকি উচ্ছিষ্ট রেখে দিয়েছেন দুনিয়াভোগীদের জন্য।

ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি মাত্র তিনটি শব্দে প্রকাশ করেছেন। আপনি চাইলে ওই তিন শব্দের ভিতরে পুরো দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ নিয়ে আসতে পারবেন। তিনি বলেন,

---

[১] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৯/২৭৪

'দুনিয়া হলো অস্থিরতার আবাসস্থল।'[১] অস্থিরতা বা উদ্বিগ্নতা কাকে বলে? অস্থিরতা হলো, কোনো কাজে স্থির হতে না পারা, মনে প্রশান্তি না থাকা এবং সবসময় অজানা ভয় ও আশঙ্কায় ভীত থাকা। ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহর সামনে দুনিয়ার এই চিত্রটাই ছিল। তিনি দুনিয়ার প্রকৃতি চিনতে পেরেছিলেন, যেন তিনি প্রতি মুহূর্তে দুনিয়ার প্রতারণা ও ধোঁকার শঙ্কা নিয়ে বসবাস করেছেন। তাই তো তাঁরা দুনিয়ার প্রতি এতটা বিতৃষ্ণ ছিলেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ এই ব্যাপারে আরও কঠোর ও বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়া একটা কুৎসিত বস্তু। আর সে তার চেয়ে বড় নিকৃষ্ট বস্তুর দিকে আকর্ষণ করে।'[২] তিনি বলতে চাচ্ছেন, দুনিয়া যেন একটি নোংরা চুম্বকের ন্যায়, যা আরও নোংরামি টেনে আনে।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের দৃষ্টিতে দুনিয়া নিকৃষ্ট ও কুৎসিত বলেই তো তিনি দুনিয়াকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর সম্পর্কে ইমরান ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, 'তিনি কখনোই কারও থেকে টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু গ্রহণ করতেন না।'[৩]

ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ একবার বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! দুনিয়ার কোনো সম্পদ আমার কাছে আসলে-গেলে এতে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস হয় না।'[৪] খেয়াল করুন, তিনি কিন্তু বলেননি যে, দুনিয়ার কোনো সম্পদ আমার কাছে আসলে আমি খুশি হই না এবং কিছু চলে গেলেও আমার আফসোস হয় না। বরং উভয় অবস্থা বোঝাতে তিনি 'আফসোস' শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। আসলে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, দুনিয়ার কিছু পাওয়া বা না পাওয়ার সাথে আনন্দ বা বেদনা যাই থাকুক, এর সাথে অস্থিরতা ও উদ্বেগও অবশ্যই থাকবে।

[১] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৮/১১
[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ২/১৭০
[৩] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ২/১৬৭
[৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৭/৩৮০

বিষাদের সুর

তাবেয়িগণের দিনগুলো ছিল দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত। তাঁদের কাছে গেলে মনে হতো, অন্তর থেকে হাহাকার ভেসে আসছে। বিষাদের সুরে ছেয়ে গিয়েছিল তাঁদের চারপাশ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হৃদয়ের তপ্ত নিঃশ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছিল। জীবনের প্রতিটি বাঁকে তাঁদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনয়াবনত অবস্থা আপনাকে হতবাক করবে, যেন দুনিয়াকে পায়ের নিচে রেখে তার ওপর তাঁরা খোদাভীতির সৌধ নির্মাণ করেছেন।

তাঁরা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকতেন। প্রচণ্ড ভয়ে অনেকের পানাহার বন্ধ হয়ে যেত। কেউ কেউ তো সালাতে একটা আয়াত শুনেই বেদনাহত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। বিশর ইবনুল ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহকে দেখেছি, তিনি যেন আল্লাহর ভয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।[১]

জাফর বলেন, 'আমি যখনই মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' রাহিমাহুল্লাহকে দেখতাম, তাকে সন্তানহারা মায়ের মতো শোকাতুর মনে হতো।'[২] তাঁরাই ইলমের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তো কুরআনুল কারিমে বলেছেন, সত্যিকারে আল্লাহর ভয় একমাত্র ইলমের অধিকারী বান্দাদের অন্তরেই থাকে। আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। [৩]

[১] সিফাতুস সাফওয়া ২/৪০৫
[২] সিফাতুস সাফওয়া ২/১৫৯
[৩] সুরা ফাতির, আয়াত : ২৮

প্রতিটি কাজকর্মে আল্লাহর ভয় তাঁদের সামনে থাকত। আল্লাহর বিধিনিষেধের সামনে আত্মসমর্পণ করাই তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

সেই সময়ের কথা, যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। মাইমুন ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহ তখনকার অবস্থার স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমি এমন বহু মানুষকে দেখেছি যারা তাদের রবের ভয়ে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকাত না।'[১] তাঁরা সবসময় মাথা নিচু করে চলতেন, মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করতেন না, এই ভয়ে যে, কখন যে জমিন তাঁদেরকে নিয়ে ধসে যায়!

দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ তার বিশালতা ও উচ্চতা নিয়ে তাঁদেরকে মহান রবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁদের স্মরণ হয়, আল্লাহ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, সুগঠিত করেছেন। প্রতিটি বস্তুকে যথাযথ আকৃতি দিয়েছেন। এরপর সঠিক পথনির্দেশনা দিয়েছেন। এই সৃষ্টিজগৎ তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান সত্তার কথা, যিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; যিনি মানুষের চোখের অপব্যবহার সম্পর্কে জানেন, অন্তরের গোপন কল্পনাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তাই তো তাঁরা ওপরের দিকে তাকাতে পারতেন না। আল্লাহর ভয় তাঁদেরকে এতটাই কাবু করে ফেলেছিল, তাঁরা মাথা ওঠাবার সাহস করতেন না। কখনোবা ওপরের দিকে তাকালে প্রচণ্ড ভয়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়তেন। সেই সাথে বিভিন্ন শাস্তির আশঙ্কা তাদের জীবনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল।

মুয়াররিক্ব আল-ইজিলী থেকে কাতাদা বর্ণনা করেন, 'একজন মুমিনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত এটা বোঝার জন্য ওই ব্যক্তির চেয়ে ভালো কোনো দৃষ্টান্ত আমি দুনিয়াতে দেখিনি, যে ভয়ের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে আর বলছে- ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি!'[২] এই দৃশ্যটি একজন মুমিনের প্রতি মুহূর্তের চালচলন এবং অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। যেন মুমিন-

[১] তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির ৬১/৩৪৫
[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ২/২৩৫

মৃত্যুর বিভীষিকা

তাবেয়িগণের কাছে মৃত্যু একটি বিভীষিকার নাম। তাঁরা মৃত্যুর ব্যাপারে এতটাই ভীত ছিলেন যে, তাঁদের আলোচনা হলে আপনার কাছে মনে হবে মৃত্যুই ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের মস্তিষ্কে মৃত্যুর ভয় এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁদের গোটা চিন্তাজগৎ জুড়ে এটা একটি আবরণ বিছিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের সিংহভাগ আলোচনা ছিল মৃত্যু নিয়ে, তাঁদের কাজকর্মও মৃত্যুর ভয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ত।

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার ছেলে আলির উপস্থিতিতে তাকে বলেছেন, 'তুমি মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নাও।' ফুযাইল বলেন, 'এ কথা শুনে আলি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর সারারাত তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।'

তাবেয়িগণ উপদেশ দিলে আগে মৃত্যুর কথা বলতেন, পরস্পরের সাথে কথা বললে মৃত্যুর আলোচনা করতেন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনাও ছিল মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে। যেন প্রতিটি পদে পদে তাঁদের কানে কানে কেউ এসে বলত, 'তোমরা কি এই পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছ?' তাঁরা যেন উঠতে-বসতে দেখতে পেতেন- কবর তাঁদেরকে অন্তিম যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রথম শতাব্দীর বসরার অলিগলি ঘুরে গেলে আচমকা একটি ভরাট কণ্ঠস্বর শুনে আপনি চমকে যাবেন। একজন বসরার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বলছেন, 'মৃত্যু দুনিয়ার জৌলুস মুছে দিয়েছে, কোনো বিবেকবান মানুষের জন্য

এখানে আনন্দিত হবার সুযোগ নেই।'[১] এ কথা শুনে আপনি ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবেন, তিনি আর কেউ নন, প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ।

তিনি বাস্তবিক অর্থেই মৃত্যুকে দুনিয়ার জন্য চূড়ান্ত বিভীষিকা মনে করতেন, এর পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। বাহ্যিকভাবে দুনিয়া চাকচিক্যময় হলেও এর শেষ পরিণতি মৃত্যুর মতো কুৎসিত। আপনি জীবনের আঁকাবাঁকা জটিল পথ ধরে সামনে আগালে দেখতে পাবেন শেষ মাথায় দু'টি চোখ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আপনার নাম ধরে কেউ ডেকে বলছে-

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।' সেই অপেক্ষারত চোখ দুটো মৃত্যুর চোখ![২]

মৃত্যু আমাদের সৌন্দর্য, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, আনন্দ–সবকিছুকে মরীচিকায় পরিণত করে দেয়। মৃত্যু সর্বপ্রথম বিবেকবান মানুষের থেকে সুখ ও সাধ-আহ্লাদ কেড়ে নেয়। এরপর আমাদের চোখে দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য নিষ্প্রভ করে দেয়। এজন্যই তো উমাইয়া সালতানাতের উজির রজা ইবনু হাইওয়াহ বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে তার ভিতর থেকে হিংসা ও আনন্দ হারিয়ে যাবে।'[৩] সে কার সাথে হিংসা করবে? যে হিংসা করবে এবং যার সাথে হিংসা করবে তারা উভয়েই তো মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। তারা কীসের আনন্দ করবে? কী নিয়ে খুশি হবে? আনন্দের সব কিছুই তো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আসবাব, যা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

[১] আল-হাম্মু ওয়াল হুযন, ইবনু আবিদ-দুনইয়া : ৬৯
[২] সুরাতুল জুমআ, আয়াত : ৮
[৩] হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৫/১৭৩